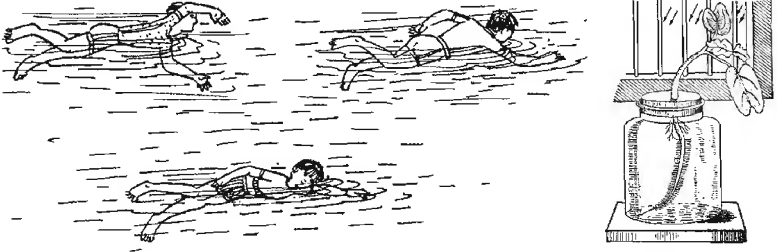


দশম অধ্যায়

সমন্বয়

আমরা জানি যে, জীব দেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া বিক্রিয়া অবিরামভাবে চলছে। এ কাজগুলো একযোগে চলে বলে এ কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয় (Co-ordination) একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে জীবের জীবনে নানারকমের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন কাজ যেমন— প্রজনন, বিপাক, অঙ্গরোদগম, সূতাবস্থা, বৃদ্ধি, চলন ইত্যাদি সকল শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। মানবদেহেও তেমনি বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন— মানব মস্তিষ্ক ও হরমোনের সমন্বয়। এ অধ্যায়ে উদ্ভিদ ও মানব দেহের সংঘটিত বিভিন্ন সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- উদ্ভিদে সমন্বয় প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণীর সমন্বয় প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাধারণ নিউরনের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রতিবর্তী প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আবেগ সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণরস বা হরমোনের প্রধান কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণরস বা হরমোনের অস্বাভাবিকতার কারণ ও এটি থেকে সৃষ্ট প্রধান শারীরিক সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- স্ট্রোকের কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- স্ট্রোকে তাৎক্ষণিক করণীয় ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- স্নায়ুিক বৈকল্য জনিত শারীরিক সমস্যার লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- সমন্বয় কার্যক্রমে তামাক ও মাদক দ্রব্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হরমোনজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে পারব।
- পোস্টার/গিফলেট অঙ্কন করে তামাক ও মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- স্নায়ুতন্ত্রে তামাক ও মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হব।

উদ্ভিদে সমন্বয়

প্রাণীর মতো প্রতিটি উদ্ভিদ কোষেও বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম একযোগে প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। এ কাজগুলো একটি নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এ কারণে উদ্ভিদ জীবনে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ডের সমন্বয় (Co-ordination) একটি অপরিহার্য কার্যক্রম। এ সমন্বয় না থাকলে উদ্ভিদ জীবনে বিভিন্ন রকমের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

একটি উদ্ভিদের জীবনকালে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবন চক্রের পর্যায়গুলো, যেমন অঙ্কুরোদগম, বৃশ্চি ও বিকাশ, পুস্পায়ন, ফল সৃষ্টি, বার্ষিক্যপ্রাপ্তি, সুস্ভাবস্থা ইত্যাদি একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে চলে। এসব কাজে আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত প্রভাবগুলোর গুরুত্বও লক্ষ করার মতো।

উদ্ভিদের বৃশ্চি ও চলনসহ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত জটিল ও চলমান। তা সত্ত্বেও এ কাজ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষ নিয়ম মেনে সম্পন্ন হয়। একটি কাজ কোনো ভাবেই অন্য কাজকে বাধা প্রদান করে না।

বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন কীভাবে হয়? উদ্ভিদের বৃশ্চি ও বিকাশ, বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্ভিদ দেহে উৎপাদিত বিশেষ এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে হয়ে থাকে। যা সকল কাজকেই নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদার্থকে হরমোন বা প্রাণরস বলে। উদ্ভিদের এই জৈব রাসায়নিক পদার্থটিকে ফাইটোহরমোন (Phytohormones) বলা হয়। কেউ কেউ ফাইটোহরমোনকে উদ্ভিদ বৃশ্চিকারক বস্তু (Plant growth substances) হিসেবে আখ্যায়িত করতে চান। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে যে রাসায়নিক বস্তুটি কোষে উৎপন্ন হয়ে উৎপত্তি স্থল থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানের কোষ বা কোষপুঞ্জের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে তাই হরমোন (Hormone)। উদ্ভিদের প্রতিটি কোষই হরমোন উৎপন্ন করতে সক্ষম। এরা কোনো পুষ্টি দ্রব্য নয় তবে ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপন্ন হয়ে কোষের বিভিন্নতা সৃষ্টি ও দেহের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। প্রাকৃতিক প্রধান হরমোনগুলো হলো অক্সিন (Auxin), জিবেরেলিন (Gibberellin), সাইটোকাইনিন (Cytokinin), অ্যাবসিসিক এসিড (Abscicic acid), ইথিলিন (Ethylene) ইত্যাদি। উদ্ভিদে যেসব হরমোন পাওয়া যায় সেগুলো হলো— অক্সিন, জিবেরেলিন, সাইটোকাইনিন এবং অ্যাবসিসিক এসিড।

উল্লিখিত এসব হরমোন ছাড়াও উদ্ভিদে আরও কিছু হরমোন রয়েছে যাদের আলাদা করা বা শনাক্ত করা যায় নি। এদের পোস্টুলেটেড হরমোন (Postulated hormones) বলে। এরা প্রধানত উদ্ভিদের ফুল ও জনন সঞ্চারিত অঙ্গের বিকাশে সাহায্য করে। এদের মধ্যে ফ্লোরিজেন (Florigen) এবং ভার্নালিন (Vernalin) প্রধান। ফ্লোরিজেন পাতায় উৎপন্ন হয় এবং তা পত্রমূলে স্থানান্তরিত হয়ে পত্রমুকুলকে পুশ্চমুকুল হিসেবে রূপান্তরিত করে। তাই দেখা যায় ফ্লোরিজেন উদ্ভিদে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে।

নিচে প্রধান ফাইটোহরমোনগুলো সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা হলো।

অক্সিন : চার্লস ডারউইন এ হরমোন প্রথম আবিষ্কার করেন। যাকে কোল (Kogl) ও হ্যাগেন স্নিট (Haagen Snit) পরবর্তীতে অক্সিন নামে অভিহিত করেন। চার্লস ডারউইন উদ্ভিদের ভূগমুকুলাবরণী (Coleoptiles) এর উপর আলোর প্রভাব লক্ষ্য করেন। যখন আলো তীর্যক ভাবে একদিকে লাগে তখন ভূগমুকুলাবরণী আলোর উৎসের দিকে বেঁকে যায়। অথচ অন্ধকারে খাড়াভাবে বৃশ্চি পায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে ভূগমুকুলাবরণীর অগ্রভাগে অবস্থিত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এর জন্য দায়ী। ঐ পদার্থটি অক্সিন নামক হরমোন। অক্সিন প্রয়োগে শাখা কলমে মূল গজায়, ফলের অকাল ঝরে পড়া রোধ করে। উদ্ভিদ কোষে অক্সিনের পরিবহন নিম্নমুখ ভাবে হয়। অক্সিন এর প্রভাবে অভিস্রবন ও স্থান ক্রিয়ার হার বৃশ্চি পায়। বীজহীন ফল উৎপাদনেও এর ব্যবহার রয়েছে।

জিবেরেলিন : ধানের ব্যাকানি (Bakanae) রোগের জীবাণু এক প্রকার ছত্রাক যা ধান গাছের অতি বৃদ্ধি ঘটায়। এই ছত্রাক থেকে এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশিত হয়, যার প্রভাবেই এরূপ অতিবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই পদার্থটি জিবেরেলিন। অধিকাংশ জিবেরেলিন উদ্ভিদের পাকা বীজে থাকে তবে চারাগাছ, বীজপত্র ও পত্রের বর্ধিস্থ অঞ্চলেও তা দেখা যায়। এর প্রভাবে উদ্ভিদের পর্বমধ্যগুলো দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। ফলে উদ্ভিদ কাণ্ডের অতিবৃদ্ধি ঘটে। এ জন্য খাটো উদ্ভিদে এ হরমোন প্রয়োগ করলে উদ্ভিদটি অন্যান্য সাধারণ উদ্ভিদ থেকেও অধিক লম্বা হয়। ফুল ফোটাতে এবং বীজের সুস্ভাব্যতা দৈর্ঘ্য কমাতে এবং অংকুরোদ্গমে এর কার্যকারিতা রয়েছে।

সাইটোকাইনিন : এ সাইটোহরমোন বা উদ্ভিদ হরমোনটি ফল, সস্য ও ডাবের পানিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো উদ্ভিদের মূলেও এদের পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এরা বিভিন্ন ঘনত্বে অঙ্গিনের সাথে যুক্ত হয়ে কোষ বিভাজনকে উদ্দীপিত করে। এছাড়া কোষবৃদ্ধি, অঙ্গের বিকাশ সাধন, বীজ ও অঙ্গের সুস্ভাব্যতা ভজ্ঞা করা ও বার্বক্য বিলম্বিতকরণে এ হরমোন ভূমিকা পালন করে। কোষে বিভাজনের সময় সাইটোকাইনিন হরমোনের প্রভাবে কোষের সাইটোকাইনিনেসিস ঘটে।

ইথিলিন : এ হরমোনটি একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। এ হরমোন ফল, ফুল, বীজ, পাতা এবং মূলেও দেখা যায়। ইথিলিন বীজ ও মুকুলের সুস্ভাব্যতা ভজ্ঞা করে, চারা গাছকে অত্যধিক লম্বা করে, চারা গাছের বৃদ্ধি, কাণ্ডের বৃদ্ধি, ফুল ও ফল সৃষ্টির সূচনা করে। ইথিলিন পাতা, ফুল ও ফলের ঝরে পড়া ত্বরান্বিত করে।

হরমোনের ব্যবহার: অঙ্গিন ও অন্যান্য কৃত্রিম হরমোন শাখাকলমে মূল উৎপাদনে সাহায্য করে। ইন্ডোল অ্যাসিটিক এসিড (IAA) নামে এক ধরনের অঙ্গিজেনের প্রভাবে ক্যাম্‌সিয়ামের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্যালাস নামক (Callus) এক প্রকার অনিয়ন্ত্রিত কোষগুচ্ছের সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতস্থান পূরণ হয়। অঙ্গিন প্রয়োগ করে ফলের মোচন বিলম্বিত করা হয়। বীজহীন ফল উৎপাদনে অঙ্গিন ও জিবেরেলিন এর ব্যবহার রয়েছে।

বৃদ্ধি (Growth)

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে আলো ও উষ্ণতার প্রভাব লক্ষণীয়। এর ফলে বিভিন্ন সংশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান উৎপন্ন হয়ে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি করে। কারো মতে আলোর উপস্থিতিতে অঙ্গিন হরমোন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় ফলে অম্বকার দিনে অঙ্গিনের ঘনত্ব বাড়ে। কেউ মনে করেন যে আলোর দিকের অংশের অঙ্গিন অম্বকার দিকে চলে যায় ফলে সেদিকে বৃদ্ধি বেশি হয় ও আলোকিত অংশের বৃদ্ধি ব্যহত হয় ফলে উদ্ভিদটি আলোর দিকে বেঁকে যায়।

ভূগম্ব বা ভূগকান্ডের অগ্রাংশ অভিকর্ষের উদ্দীপনা অনুভব করতে পারে। একে অভিকর্ষ উপলব্ধি (Geoperception) বলে। অভিকর্ষের ফলে কোষের উপাদানগুলো নিচে স্থানান্তরিত হয়। এদের চাপ পড়ে পানীয় কোষের প্রাচীরে। এর ফলে অভিকর্ষীয় চলন দেখা যায়। উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে আলো ও উষ্ণতার প্রভাব লক্ষণীয়। এর ফলে বিভিন্ন সংশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান উৎপন্ন হয়ে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি করে। এর ফলে কোষের উপাদানগুলি নিচে স্থানান্তরিত হয়।

চন্দ্রমল্লিকা একটি হুসুদিবা উদ্ভিদ। উদ্ভিদটির পত্র আলোক পর্যায়ের উদ্দীপক উপলব্ধির স্থান বলে পরিগণিত হয়। দীর্ঘ অম্বকার দীর্ঘদিবা উদ্ভিদে পুষ্প উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু দীর্ঘ আলোক প্রাপ্ত ঐসব উদ্ভিদে পুষ্প উৎপাদনে সহায়ক। অতএব বলা যায় উদ্ভিদের পুষ্প প্রস্ফুটন দিবাদৈর্ঘ্যের উপর অধিক নির্ভরশীল। উদ্ভিদে আলো-অম্বকারের ছন্দকে বায়োলজিক্যাল ক্লক বলে।

উদ্ভিদের আলো-অন্ধকারের হ্রদের উপর ভিত্তিকরে পুষ্পধারী উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

১. ছোট দিনের উদ্ভিদ : পুষ্পায়নে দৈনিক গড়ে ৮—১২ ঘণ্টা আলো প্রয়োজন। যেমন— চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া।
২. বড় দিনের উদ্ভিদ : পুষ্পায়নে দৈনিক গড়ে ১২—১৬ ঘণ্টা আলো প্রয়োজন যেমন— লেটুস, বিজ্ঞা।
৩. আলোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ : পুষ্পায়নে দিনের আলো কোনো প্রভাব ফেলে না। যেমন— শসা, সূর্যমুখী।

উদ্ভিদের বৃষ্টি ও পুষ্পায়নে আলোর মতো ভাগ ও শৈত্যেরও প্রভাব রয়েছে। দেখা গেছে অনেক উদ্ভিদের অঙ্কুরিত বীজকে শৈত্য প্রদান করা হলে তাদের কুল ধারণের সময় এগিয়ে আসে। শৈত্য প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভিদের কুল ধারণ কে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াকে বার্নালাইজেশন (Vernalization) বলে। উদ্ভিদে পুষ্প সৃষ্টিতে উষ্ণতার প্রভাব বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। শীতের গম গ্রমকালে লাগালে ফুল আসতে বহু দেরি হয়। কিন্তু বীজ রোপণের পর ২°—৫° উষ্ণতা প্রয়োগ করলে উদ্ভিদে স্বাভাবিক পুষ্প প্রস্ফুটন ঘটে। বিভিন্ন উদ্ভীপক, যেমন আলো, অভিকর্ষ ইত্যাদি উদ্ভিদের বৃষ্টিকে প্রভাবিত করে।

এভাবেই উদ্ভিদ তার শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়।

চলন (Movement)

উদ্ভিদ অন্যান্য জীবের মতো অনুভূতি ক্ষমতা সম্পন্ন। এজন্য অভ্যন্তরীণ বা বহিঃ উদ্ভীপক উদ্ভিদ দেখে যে উদ্ভীপনা সৃষ্টি করে তার ফলে উদ্ভিদে চলন সংঘটিত হয়। কতগুলো চলন উদ্ভিদ দেহের বৃষ্টিজনিত আবার কিছু চলন অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক উদ্ভীপকের প্রভাবে হয়ে থাকে। চলন যে ভাবেই হোক না কেন তা অবশ্যই কোনো না কোনো প্রভাবকের কারণে ঘটে থাকে।

উদ্ভিদ চলনকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— সামগ্রিক চলন (Movement of locomotion) ও বক্রচলন (Movement of curvature)। উদ্ভিদ দেহের কোনো অংশ যখন সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনের ভাগিদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে তাকে সামগ্রিক চলন বলে। যেমন, ছত্রাক ও উন্নত শ্রেণির উদ্ভিদের বৌন জনন কোষ (Gametes) এবং জুলোরে এ ধরনের চলন দেখা যায়। তাছাড়া কিছু ব্যাকটেরিয়া ও কিছু শৈবালে যেমন— *Volvox*, *Chlamydomonas* ও ডায়্যাটম শৈবালেও এ ধরনের চলন পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে মাটিতে আবদ্ধ উন্নত শ্রেণির উদ্ভিদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করতে পারে না। তবে প্রয়োজনে এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে চালনা করতে পারে এবং এদের অঙ্গগুলো নানাবিধে বঁকে যায়। এ ধরনের চলনকে বক্রচলন বলে। কাঁড়ের আলোকমুখী চলন, মূলের অন্ধকারমুখী চলন, আকর্ষীর অবলম্বনকে পেঁচিয়ে ধরা ইত্যাদি বক্রচলনের উদাহরণ। সামগ্রিক চলন ও বক্রচলন আবার নানা ধরনের হয়। তার মধ্যে ফটোট্রপিক চলন উল্লেখযোগ্য। নিচে ফটোট্রপিক চলন বা ফটোট্রপিজম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।



চিত্র—১০.১: উদ্ভিদের আলোর প্রতি সাড়া প্রদান।

ফটোট্রপিক চলন বা ফটোট্রপিজম (Phototropic movement or phototropism) : ফটোট্রপিক চলন এক ধরনের বক্রচলন। উদ্ভিদের কাণ্ড ও শাখা প্রশাখার সবসময় আলোর দিকে চলন ঘটে এবং মূলের চলন সবসময় আলোর বিপরীত দিকে হয়। কাণ্ডের আলোর দিকে চলনকে পজিটিভ ফটোট্রপিজম এবং মূলের আলোর বিপরীত দিকে চলনকে নেগেটিভ ফটোট্রপিজম বলে।

কাজ-১ : শ্রেণিকক্ষের জানালায় টবসহ একটি উদ্ভিদ রেখে এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রাপ্ত ফলাফল যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

কাজ-২ : কয়েকটি অভিকুরিত ছোলা বীজের সাহায্যে মূলের ভূ-অভিমুখী চলন পরীক্ষা কর ও প্রাপ্ত ফলাফল যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

প্রাণীর সমন্বয় প্রক্রিয়া

হরমোনাল প্রভাব : প্রাণীর প্রয়োজনীয় সমন্বয় কাজ স্নায়ু ছাড়া ও হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। হরমোন কী তা তোমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জানতে পারবে। হরমোনের কারণে প্রাণী তার কার্যকলাপ অর্থাৎ নড়াচড়া বা আচরণের পরিবর্তন করে থাকে। এই বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর গবেষণা হয়েছে। হরমোন নানা ধরনের নালিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। নালিহীন গ্রন্থিগুলো একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা গেছে নালিহীন গ্রন্থির কার্যকলাপ আবার স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ব্যাপারটা এই রকম যে কোনো কারখানার কার্যক্রমে হরমোনকে যদি শ্রমিক ধরা হয়, তবে সার্বিকভাবে কোন শ্রমিক, কোথায়, কতক্ষণ কাজ করবে তা যেমন ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণ করেন তেমনি 'স্নায়ুতন্ত্র' হরমোনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

সমন্বয় সাধনে নানা প্রাণী হরমোন ব্যবহার করে। কোনো পিপড়া খাদ্যের খোঁজ পেলে খাদ্য উৎস থেকে বাসায় আসার পথে এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত করে। যাকে ফেরোমন বলে। এর উপর নির্ভর করে অন্য পিপড়াগুলোও খাদ্য উৎসে যায় এবং খাদ্য সংগ্রহ করে বাসায় ফিরে আসে। এই কারণে পিপড়াদের এক সারিতে চলাচল করতে দেখা যায়। খাদ্য শেষ হলে পিপড়া ফেরোমন নিঃস্বরণ বন্ধ করে দেয়, যা বাতাসে উবে যায় সহজেই আর অন্য পিপড়াদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য না যেতে প্রভাবিত করে। কোনো কোনো পতঙ্গ ফেরোমন দিয়ে তার স্ব-প্রজাতির সঙ্গীকে খুঁজে পেতে পারে। দেখা গেছে কোনো কোনো পতঙ্গ বাতাসে ফেরোমন নিঃসৃত করলে ২-৪ কিলোমিটার দূর থেকে তার সঙ্গীরা আকৃষ্ট হয়। তোমরা হয়তো ফেরোমন ব্যবহারে পোকা ধ্বংসের কাজটি দেখেছ। এখানে ফেরোমনের কারণে আকৃষ্ট হয়ে অনিষ্টকারী পোকা ফাঁদে ও গানিতে ডুবে মারা যায়। অনিষ্টকারী পোকা দমনে এ পদ্ধতিটি খুবই পরিবেশ বান্ধব।

স্নায়বিক প্রভাব

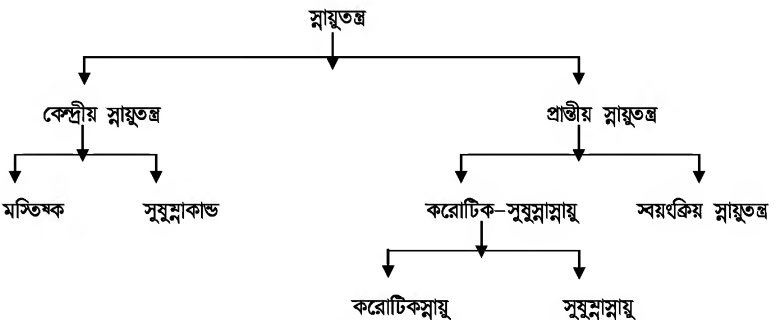
হাঁটাচলা, উঠাবসা, কথা বলা, চিন্তা করা, পড়া মুখস্থ করা, হাসিকান্না ইত্যাদি কাজগুলো করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ অংশ নেয়। এ অঙ্গগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে একটি সমন্বয় ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনতন্ত্র দেহের কাজ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করে। যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী উদ্ভেজনা সাড়া দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সড়যোগ সাধন করে এবং তাদের কাজে সুসংবদ্ধতা আনয়ন ও শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকেই স্নায়ুতন্ত্র বলে।

আমাদের সমগ্র দেহের বিভিন্ন কাজের সুসংবদ্ধতার জন্য প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ কোষের কাজের সমন্বয় সাধন (Co-ordination)। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেহ চলে পরিবেশের উদ্দীপনা ও সাড়া জাগানোর ফলে। দেহের বাইরের জগৎ হলো বাহ্যিক পরিবেশ এবং দেহের ভিতর হলো অভ্যন্তরীণ পরিবেশ। বাহ্যিক পরিবেশের উদ্দীপক হলো আলো, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ। এসব চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং চর্মের অনুভূতিবাহী স্নায়ু প্রান্তে উদ্দীপনা জাগায়। অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উদ্দীপক হলো চাপ, তাপ ও বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু। এরা অভ্যন্তরীণ অঙ্গের কেন্দ্রমুখী প্রান্তে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। যেকোনো উদ্দীপক অনুভূতি ও কেন্দ্রমুখী স্নায়ুতে তাড়না সৃষ্টি করে। এই তাড়না মস্তিষ্কে পৌঁছে। মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে অজ্ঞাবাহী বা মোটর স্নায়ু যোগে তাড়না পাঠিয়ে পেশি কিংবা গ্রন্থিতে সাড়া জাগায় ও কোনো কাজ করতে সাহায্য করে।

স্নায়ুতন্ত্র ছাড়াও হরমোন নামক বিশেষ কতগুলো রাসায়নিক দ্রব্য দেহের সমন্বয়ে অংশ নেয়। তবে এরা মস্তিষ্কের অধীন। প্রথমে ধারণা ছিল সব হরমোনই উদ্ভেজক পদার্থ। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে সব হরমোন উদ্ভেজক নয়, এদের মধ্যে কিছু রোধক আছে। হরমোন অতি অল্প পরিমাণে বিশেষ বিশেষ শারীরবৃত্তীয় কাজ বা পদ্ধতি সুস্বভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এরা উদ্ভেজক বা রোধক হিসেবে দেহের পরিষ্কটন, বৃদ্ধি ও বিভিন্ন টিস্যুর কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির আচরণ, স্ভাব্য ও আবেগ প্রবণতার উপরও হরমোনের প্রভাব অপরিসীম। এগুলো রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী কোনো কোষ বা অঙ্গকে উদ্দীপিত করে। এজন্য এদেরকে রাসায়নিক দূত হিসেবে অভিহিত করা হয়।

স্নায়ুতন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং দেহের উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ দেহের বিভিন্ন অংশে উদ্দীপনা বহন করা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধন করা এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা।

নিচে স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস ছকে দেওয়া হলো:-



কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system)

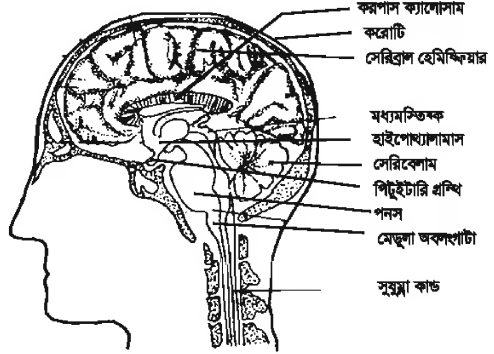
মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে সুরক্ষিত থাকে।

মস্তিষ্ক (Brain)

সুষুম্নাকাণ্ডের শীর্ষে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে সীমিত অংশ করোটির মধ্যে অবস্থান করে, তাকে মস্তিষ্ক বলে। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের পরিচালক। মস্তিষ্ক তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা- ক. অগ্র মস্তিষ্ক খ. মধ্য মস্তিষ্ক এবং গ. পশ্চাৎ মস্তিষ্ক।

ক. অগ্র মস্তিষ্ক (Forebrain বা Prosencephalon) : মস্তিষ্কের মধ্যে সেরিব্রাম সবচেয়ে বড় অংশ। সেরিব্রামের ডান ও বাম অংশ দুটি অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত। দুটি অংশের মাঝখানে বিভেদক ঝাঁজ থাকায় এ বিভক্তি ঘটে।

এপের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার (Cerebral hemisphere) বলা হয়। বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান অংশ এবং ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের এ অংশটির উপরিভাগ ঢেউ তোলা। মানুষের সেরিব্রামের বাম অংশে ভুলনামূলকভাবে বেশি উন্নত। সেরিব্রামকে গুরুমস্তিষ্ক বলা হয়। এটি মেনেনজেস নামক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এর বাইরের স্তরের নাম কর্টেক্স। কর্টেক্স অসংখ্য নিউরন দ্বারা গঠিত। এর রং ধূসর। তাই কর্টেক্সের অপর নাম গ্রেম্যাটার (Gray matter) বা ধূসর পদার্থ যা মেরুদণ্ডের ভিতর আন্তঃযোগাযোগ রক্ষা করে।



চিত্র ১০.২ : মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

সেরিব্রামের ভিতরের স্তরে স্নায়ুতন্ত্র থাকে। স্নায়ুতন্ত্রের রং সাদা। এই স্তরের নাম শ্বেত পদার্থ (White matter)। শ্বেত পদার্থ মেরুদণ্ডের উপরে ও নিচে স্নায়ু ত্যাগনা বহন করে।

সেরিব্রাম হলো প্রত্যেক অঙ্গ থেকে স্নায়ু ত্যাগনা গ্রহণের এবং প্রত্যেক অঙ্গে স্নায়ু ত্যাগনা প্রেরণের উচ্চতর অঙ্গ। দেহ সঞ্চালন তথা প্রত্যেক কাজের ও অনুভূতির কেন্দ্র হলো সেরিব্রাম। এটি আমাদের চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা, বাকশক্তি ও ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। কোন উদ্দীপকের প্রতি কি ধরনের সাড়া দিবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

খ. মধ্যমস্তিষ্ক (Midbrain বা Mesencephalon) : পশ্চাৎ মস্তিষ্কের উপরের অংশ হলো মধ্যমস্তিষ্ক। এটি অগ্র ও পশ্চাৎ মস্তিষ্ককে সংযুক্ত করে। মধ্যমস্তিষ্কের পিছনে অবস্থিত নলাকৃতি বৃহৎ অংশের নাম পনস। এটি সেরিকোম ও মেডুলা অবলংগাটার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। বিভিন্ন পেশির কাজের সমন্বয় সাধন ও ভারসাম্য রক্ষা করা মধ্যমস্তিষ্কের কাজ।

গ. পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (Hindbrain বা Rhombencephalon) : এটি সেরিকোম, পনস ও মেডুলা অবলংগাটা নিয়ে গঠিত।

সেরিবেলুম (Cerebellum) : পনসের পৃষ্ঠীয় ভাগে অবস্থিত ঋতুাংশটি সেরিবেলুম। এটি ডান ও বাম দুই অংশে বিভক্ত। এর বাইরের দিকে খুসর পদার্থের আবরণ ও ভিতরের দিকে শ্বেত পদার্থ থাকে।

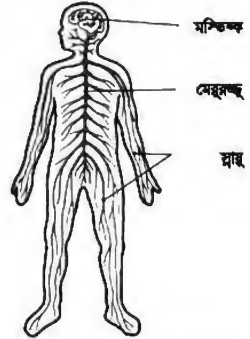
সেরিবেলুম দেহের শৈশির টান নিয়ন্ত্রণ, চলনে সমন্বয় সাধন, দেহের ভারসাম্য রক্ষা, পৌড়ানো ও লাকানোর কাজে জড়িত শৈশিগুলোর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।

পনস (Pons) : মেডুলা অবলংগাটা ও মধ্যমস্তিষ্কের মাঝখানে পনস অবস্থিত। এটি একপুচ্ছ স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয়ে তৈরি।

মেডুলা অবলংগাটা (Medulla oblongata) : এটি মস্তিষ্কের সবচেয়ে শিছনের অংশ। এর সামনের দিকে রয়েছে পনস, শিছনের দিক সুব্রহ্মা কাডের উপরিতাঙ্গের সাথে যুক্ত।

যেটি বারো জোড়া করোটিক স্নায়ুর (Cranial nerves) মধ্যে মেডুলা অবলংগাটা থেকে আট জোড়া করোটিক স্নায়ু উৎপন্ন হয়। এসব স্নায়ু খাদ্য গলাধঃকরণ, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, গলাবিল ইত্যাদির কিছু কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এই স্নায়ুগুলো শ্রবণ ও ভারসাম্যের মতো পুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত।

মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া বার জোড়া করোটিক স্নায়ু মাথা, ঝাড়, মুখমণ্ডল, মুখগহ্বর, জিহ্বা, ঢাখ, নাক, কান ইত্যাদি অঙ্গে বিস্তৃত। স্নায়ুগুলো সবেদী অথবা মোটর অথবা মিশ্র প্রকৃতির।



চিত্র ১০.৩ : মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

মেডুলা (Spinal cord) : মেডুলা করোটিক শিছনে অবস্থিত মহা ছিদ্রটি (Foramen magnum) থেকে কাটদেশে কশেরুকা পর্বত প্রাপ্ত। মেডুলা মেডুলা কশেরুকার ভিতরের ছিদ্রপথে সুরক্ষিত থাকে।

মেডুলাতে শ্বেত পদার্থ ও খুসর পদার্থ থাকে। তবে এদের অবস্থান মস্তিষ্কের ঠিক উল্টো। অর্থাৎ শ্বেত পদার্থ থাকে বাইরে আর ভিতরে থাকে খুসর পদার্থ। দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী ছিদ্র দিয়ে মেডুলা থেকে ৩১ জোড়া মেডুলাস্টীম স্নায়ু বের হয়। এসব ঘাড়, পলা, বুক, পিঠ, হাত ও পায়ের স্নায়ু। এসব স্নায়ু মিশ্র প্রকৃতির। মানবদেহে স্নায়ুতন্ত্র যে কাজগুলো করতে সাহায্য করে তা হলো বিভিন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং তদানুযায়ী উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করা, স্মৃতি সঞ্জন করা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা ও বিভিন্ন অজ্ঞাততন্ত্রের সমন্বয় করা।

স্নায়ুকলা (Nervous tissue)

যে কলা দেহের সব ধরনের সঞ্জন ও উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং তা পরিবহনের মাধ্যমে উদ্দীপনা অনুসারে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে সেটাই স্নায়ুকলা। বহু সংখ্যক স্নায়ুকোষ বা নিউরনের সমন্বয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। নিউরনই স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যিক একক।

নিউরনের গঠন

প্রতিটি নিউরন দুটি প্রধান অংশে নিরে গঠিত, যথা— ক. কোষদেহ এবং খ. প্রসঞ্চিত অংশ।

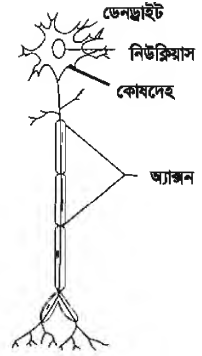
ক. কোষদেহ (Cell body) : প্রাথম মেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস সমন্বয়ে গঠিত নিউরনের পোলাকার, তারকাকার, অথবা ডিম্বাকার অংশ কোষদেহ নামে পরিচিত। সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গ্লাজিকালু, লাইসোসোম,

চর্বি, গ্রাইকোজেন, মজ্জক কণাসহ অসংখ্য নিসল দানা থাকে।

৭. **প্রলম্বিত অংশ :** কোষদেহ থেকে সূঁচ শাখা প্রশাখাকেই প্রলম্বিত অংশ বলে। প্রলম্বিত অংশ দুই ধরনের, যথা—

১) **ডেনড্রাইট (Dendrite) :** কোষদেহের চারদিকের শাখামুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে ডেনড্রাইট বলে। একটি নিউরনের ডেনড্রাইট সংখ্যা শূন্য থেকে কয়েকটি পর্যন্ত হতে পারে।

২) **অ্যাক্সন (Axon) :** কোষদেহ থেকে উৎপন্ন বেশ লম্বা শাখাহীন তন্তুটির নাম অ্যাক্সন। এর চারদিকে পাতলা আবরণটিকে নিউরিলেমা বলে। নিউরিলেমা পরিবেষ্টিত অ্যাক্সনকে স্নায়ুতন্তু বলে। বহু সংখ্যক অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট মিলিত হয়ে স্নায়ু গঠন করে। নিউরিলেমা ও অ্যাক্সনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ক্রোহ পদার্থের একটি স্তর থাকে। একে মায়োলিন বলে।



চিত্র ১০.৪ : একটি নিউরন

এ আবরণটি অবিচ্ছিন্ন নয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর এটি সাধারণত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। এই বিচ্ছিন্ন অংশে নিউরিলেমার সাথে অ্যাক্সনের প্রত্যক্ষ সংলগ্ন ঘটে। এই আবরণবিহীন অংশটি র্যানভিয়ার এর পর্ব (Node of Ranvier) নামে পরিচিত। অ্যাক্সনের মূল অক্ষের আবরণীকে অ্যাক্সলেমা (Axolemma) বলে।

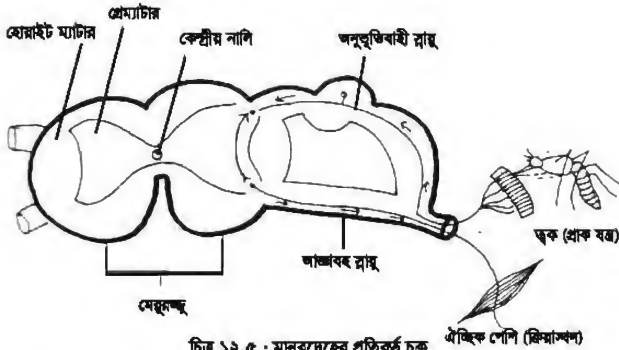
একটি নিউরনের অ্যাক্সনের সাথে দ্বিতীয় একটি নিউরনের ডেনড্রাইট যুক্ত থাকে। এই সংযোগস্থলকে সিন্যাপস (Synapse) বলে। প্রকৃতপক্ষে পর পর অবস্থিত দুটি নিউরনের সন্ধিস্থল হলো সিন্যাপস। সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক (Electro chemical) পদার্থভিত্তে স্নায়ু তড়ান প্রবাহিত হয়। সিন্যাপসে নিউরোহিউমার নামক তরল পদার্থ থাকে। কোনো একটি নিউরনের মধ্য দিয়ে স্নায়ু তড়ান প্রবাহিত হয়ে পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটে যায়। এর ভিতর দিয়ে স্নায়ু উদ্দীপনা বা স্নায়ু তড়ান একদিকে পরিবাহিত হয়। নিউরনের প্রধান কাজ উদ্দীপনা বহন করা। অনুভূতিবাহী নিউরন গ্রাহক অঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং মোটর বা আঙ্গাবাহী নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কার্যকরী অঙ্গে উদ্দীপনা প্রেরণ করে।

কাজ : একটি নিউরনের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

একটি টর্চ লাইট দিয়ে তোমার বন্ধুর চোখে আলো ফেল। লক্ষ করে দেখ, আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারা ছোট হয়ে গেল। কেন এমন হলো? আলোর উদ্দীপনাজনিত তড়ান রোটিনা থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছালে এর নির্দেশে আইরিশের বৃত্তাকার বা গোলাকার পেশি সংকোচিত হয়। ফলে চোখের তারা ছোট হয়ে যায়। উদ্দীপনার আকস্মিকতায় স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex action)

প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে উদ্দীপনার আকস্মিকতা ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়াকে বুঝায়। হঠাৎ করে আঙুলে সূঁচ খুঁটলে অথবা হাতে গরম কিছু পড়লে আমরা অতিদ্রুত হাতটি উদ্দীপনার স্থান থেকে সরিয়ে নেই। এটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফল। আমরা ইচ্ছা করলে প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। প্রতিবর্তী ক্রিয়া মূলত সুঘুম্মা কান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, মস্তিষ্ক দ্বারা নয়। অর্থাৎ যেসব উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সুঘুম্মা কান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।



হয়। এটি মাসপেশিতে সঞ্চালিত হলে বেশি সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়। কলে প্রয়োজন যতটা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। এই তড়ুনা গ্রন্থিতে পৌঁছালে সেখানে রস ক্রিত হয়। অনুভূতিবাহী স্নায়ু উদ্ভেজিত হলে সেই উদ্ভেজনা মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হয়ে যন্ত্রণাবোধ, সর্গভান, দর্শন প্রভৃতি অনুভূতি উপলব্ধি করায়।



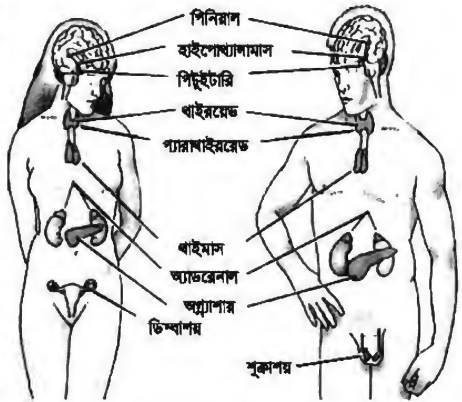
চিত্র ১০.৬ : আবেগ সঞ্চালন প্রক্রিয়া

স্নায়ু তড়ুনা কীভাবে কাজ করে তা নিম্নের উদাহরণ থেকে বুঝা যায়। মনে কর, শিক্ষক লুতলিগি দিচ্ছেন এক ছুঁমি লিখছে। এ ক্ষেত্রে পুস্তক থেকে প্রতিফলিত আলো শিক্ষকের চোখের রোটিনার উদ্দীপনা জাগায়। স্নায়ু তড়ুনায় সৃষ্টি হয়। এটা চোখের স্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কের সূতিকেন্দ্রে পৌঁছে। সেখান থেকে এ তড়ুনা পর পর চিত্তাকেন্দ্রে, সূতিকেন্দ্রে প্রভৃতি হয়ে মুখমন্ডলের ঐচ্ছিক পেশিকে নির্দেশ দেয়। পেশি সংকুচিত হয়ে সাড়া গ্রহণ করে। এখানে শিক্ষকের কথা বলার পেশিগুলো হলো প্রধান সাড়া অঙ্গ।

শিক্ষকের কথা বাতাসে শব্দ ভরল্ল সৃষ্টি করে। এই শব্দ ভরল্ল ছাড়ের কানের পর্দায় উদ্দীপনা জাগায়, যা শ্রবণস্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে পৌঁছে। সেখান থেকে তড়ুনা ছাড়ের সূতিকেন্দ্রে, চিত্তাকেন্দ্রে প্রভৃতি হয়ে মোটরস্নায়ুখোলে ছাড়ের ঐচ্ছিক পেশিতে পৌঁছে। পেশির নির্দেশে সাড়া দিয়ে সে হাত দিয়ে লিখতে থাকে। এখানে ছাড়ের পেশি হলো প্রধান সাড়া অঙ্গ।

হরমোন কী?

মানবদেহে ৩ বিভিন্ন প্রাণীর দেহে একধরনের বিশেষ নালিবিহীন গ্রন্থি থাকে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নালিবিহীন গ্রন্থি নিঃসৃত এ ধরনের রসকে হরমোন বলে। হরমোন পরিবহনের জন্য পৃথক কোনো নালি নেই। হরমোন রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকোষে পৌঁছে কোষের প্রাণরাসায়নিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে, জৈবিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে। সুস্থ দেহের চাহিদা অনুসারে গ্রন্থি থেকে অবিরত ধারায় হরমোন নিঃসৃত হয়। তবে প্রয়োজন অপেক্ষা কম অথবা বেশি পরিমাণ হরমোন নিঃসৃত হলে দেহে নানানরকম অবস্থিতি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।



চিত্র ১০.৭ : মানবদেহের মূখ্য নালিবিহীন গ্রন্থি সমূহ

মানবদেহের কয়েকটি মূখ্য নালিবিহীন গ্রন্থির পরিচিতি, কাজ ও নিঃসৃত হরমোন

পিটুইটারি গ্রন্থি : পিটুইটারি গ্রন্থি বা হাইপোফাইসিস মস্তিষ্কের নিচের অংশে অবস্থিত। পিটুইটারি গ্রন্থি মানবদেহের হরমোন উৎপাদনকারী প্রধান গ্রন্থি। কারণ একদিকে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন সংখ্যায় যেমন বেশি, অপরদিকে অন্যান্য গ্রন্থির উপর এসব হরমোনের প্রভাবও বেশি। দেহের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নালিবিহীন গ্রন্থি হলেও এটি আকারে সবচেয়ে ক্ষুদ্র। এই গ্রন্থি থেকে গোনাদোট্রোপিন, এডরেনোকোর্টিকোট্রোপিন, থাইরোট্রোপিন, প্রোল্যাকটিন ইত্যাদি হরমোন নিঃসৃত হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি : থাইরয়েড গ্রন্থি গলায় ট্রাকিয়ার উপরের অংশে অবস্থিত। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন সাধারণত বিপাকের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। চোখ বের হয়ে আসার রোগটি থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যার কারণে হয়ে থাকে। আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায় ও গলগল গঠন করে। আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থি থেকে প্রধানত থাইরক্সিন হরমোন নিঃসরণ হয়।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি : প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাইরয়েড গ্রন্থির পিছনে অবস্থিত। হরমোন মূলত শরীরের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থি থেকে প্রধানত প্যারাথাইরক্সিন হরমোন নিঃসৃত হয়।

থাইমাস গ্রন্থি : থাইমাস গ্রন্থি গ্রীবা অঞ্চলে অবস্থিত। থাইমাস গ্রন্থি দেহের জনন অঙ্গের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শিশুকালে এই গ্রন্থি বিকশিত থাকে পরে বয়স্কবৃদ্ধির সাথে সাথে ছোট হয়ে যায়। এই গ্রন্থি হতে থাইমক্সিন হরমোন নিঃসরণ হয়।

এডরেনাল গ্রন্থি : এডরেনাল গ্রন্থি কিডনির উপরে অবস্থিত। এডরেনাল গ্রন্থি দেহের অত্যাবশ্যকীয় বিপাকীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থি মূলত কঠিন মানসিক চাপ থেকে পরিত্রাণে সাহায্য করে। এই গ্রন্থি এ্যাডরেনালিন হরমোন নিঃসৃত করে।

আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস : আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস অগ্ন্যাশয়ের মাঝে অবস্থিত। আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস কোষগুচ্ছ শরীরের শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এর নালিহীন কোষগুলি ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নিঃসরণ করে যা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এই কোষগুচ্ছ ইনসুলিন হরমোন নিঃসৃত করে।

গোনাড বা জনন অঙ্গ গ্রন্থি : এটি মেয়েদের ভিম্বাশয় ও ছেলেদের শূক্ৰাশয়ে অবস্থিত। জনন অঙ্গ থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহের পরিণত বয়সের লক্ষণসমূহ বিকশিত করতে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও প্রাণীর জনন অঙ্গের বৃদ্ধি, জননচক্র ও যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জনন অঙ্গ থেকে পরিণত বয়সের পুরুষে টেস্টোস্টেরন ও স্ত্রী দেহে ইস্ট্রোজেন হরমোন উৎপন্ন হয়।

প্রাণরস বা হরমোনজনিত অস্বভাবিকতা

থাইরয়েড সমস্যা : সমুদ্রের পানিতে আয়োডিন থাকায় সামুদ্রিক মাছ মানুষের খাদ্যে আয়োডিনের অন্যতম মূল উৎস। আয়োডিনযুক্ত খাবার খেলে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়। দেখা গেছে সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত এলাকা যেমন হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল কিংবা বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গো, মানুষের গলা ফোলা রোগ গলগল বা গয়টার রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হলে শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধা পায়। ফলে যেমন গায়ের চামড়া খসখসে হয় ও চেহারা গোলাকার গোবেচারা আকারের মুখমণ্ডল তৈরি হয়। আয়োডিনের অভাবে হরমোন এর উৎপাদন

ব্যাহত হলে শিশুদের বৃদ্ধি বিকাশ কমে যায়। এই জন্য খাদ্যে আরোডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সফল পাওয়া যায়। এছাড়া কলা, ফলমূল, কচু, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি খেলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস : অগ্ন্যাশয়ের ভিতর আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস নামক এক প্রকার গ্রন্থি আছে, এই গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। ইনসুলিন হলো এক প্রকার হরমোন যা দেহের শর্করা পরিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। অগ্ন্যাশয়ে যদি প্রয়োজনমতো ইনসুলিন তৈরি না হয় তবে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়, প্রস্রাবের সাথে গ্লুকোজ নির্গত হয়। এ অবস্থাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। ডায়াবেটিস দুই ধরনের হয়, যথা- টাইপ-১ ও টাইপ-২। টাইপ-১ এ আক্রান্ত রোগীর দেহে একেবারে ইনসুলিন তৈরি হয় না। তাই ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হয়। অন্যদিকে টাইপ-২ রোগীর দেহে আংশিকভাবে ইনসুলিন তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ঔষধ খেয়ে অগ্ন্যাশয় কোষকে শরীরের জন্য পরিমিত ইনসুলিন তৈরিতে সাহায্য করে। এ রোগটি সাধারণত বংশগত ও পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে। এটি সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ নয়। রক্তে ও প্রস্রাবে গ্লুকোজের মাত্রা পরিমাণের চেয়ে বেড়ে গেলে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলো হলো ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অধিক পিপাসা লাগা, ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া, পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া সত্ত্বেও দেহের ওজন কমেতে থাকে, দুর্বলতা বোধ করা, চোখে কম দেখা, চামড়া খসখসে ও রুক্ষ হয়ে যাওয়া, ক্ষতস্থান সহজে না শুকানো ইত্যাদি।

আগে ধারণা করা হতো কেবলমাত্রা বয়স্কদের এ রোগটি হয়। এ ধারণাটি সঠিক নয়। ছোট বড় সব বয়সীদের এ রোগ হতে পারে। তবে যারা কায়িক পরিশ্রম করেননা, দিনের বেশির ভাগ সময় বসে কাজ করেন অথবা অলস জীবন যাপন করেন তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাছাড়া স্থূলকায় ব্যক্তিদের এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ রোগ বংশগত। কোনো ব্যক্তির বাবা, মা, দাদা, দাদির এ রোগ থাকলে তার এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। বংশগতভাবে অনেক শিশুর দেহে ইনসুলিন উৎপাদন কম হয়, ফলে শিশুটির ইনসুলিন ঘাটতিজনিত অসুস্থতায় ভুগতে থাকে।

ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা : রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা দ্বারা গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়ের মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসা দ্বারা ডায়াবেটিস রোগ একেবারে নিরাময় করা যায় না, কিন্তু এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডাক্তারদের মতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি 'D' মেনে চলা অত্যাবশ্যক। এগুলো হলো-Discipline, Diet ও Dose।

ক. শৃঙ্খলা (Discipline) : একজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তার সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থা মহৌষধস্বরূপ। এছাড়া (১) নিয়মিত ও ডাক্তারের পরামর্শমতো পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করা, (২) নিয়মিত ব্যায়াম করা, (৩) রোগীর দেহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বিশেষভাবে পায়ের যত্ন নেওয়া, (৪) নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা করা, (৫) দৈনিক কোনো জটিলতা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।

খ. খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (Diet) : ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হলো খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা। মিষ্টিজাতীয় খাবার পরিহার করা ও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ও সময়মতো খাদ্য গ্রহণ করা। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাবারের মেনু অনুসরণ করলে সফল পাওয়া যায়।

গ. ঔষধ সেবন (Dose) : ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঔষধ সেবন করা উচিত নয়। ডাক্তার রোগীর শারীরিক অবস্থা বুঝে ঔষধ খাওয়া বা ইনসুলিন নেওয়ার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হবে। ঠিকমতো চিকিৎসা না করা হলে রোগীর খুসন হার কমে যায়, পানি সঞ্চারণ কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে রোগী বেহুশ হয়ে পড়ে। অনেক সময় রোগীর হৃদয়ন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

স্ট্রোক (Stroke) : মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ চলতি কথায় স্ট্রোক বলা হয়। এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। সাধারণত ধমনিগাত্র শক্ত হয়ে যাওয়া ও উচ্চ রক্ত চাপজনিত কারণে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে। অনেক সময় অত্যধিক স্নায়বিক চাপ যেমন—উদ্বেজনা বা অধিক পরিশ্রমের কারণে এরূপ রক্তক্ষরণ হয়। মস্তিষ্কের যে কোনো ধমনিতে রক্তক্ষরণ সম্ভব। নির্গত রক্ত মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন করে। রক্ত মস্তিষ্কের গহ্বরে ও মাথার খুলিতে ঢুকে গেলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

রোগের লক্ষণ : এই রোগের লক্ষণ হঠাৎ করেই প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলো হলো— বমি, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, কয়েক মিনিটের মধ্যে রোগী সঙ্জ্ঞা হারায়, ঘাড় শক্ত হয়ে যেতে পারে, মাংসপেশি শিথিল হয়ে যায়, শ্বসন ও নাড়ির স্পন্দন কমে যায়, মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ধারণ করে।

এই অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। উপযুক্ত চিকিৎসা করা হলে রোগী অনেক সময় বেঁচে যায়। রোগী যদি বেঁচে যায়, কয়েকদিন পর সে তার সঙ্জ্ঞা ফিরে পায়। তবে রোগী কিছুটা হটকট করে এবং আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যাওয়া অঙ্গে দৃঢ়তা ফিরে আসে। জ্ঞান ফিরে এলে বাক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রোগীর কথা জড়িয়ে যায়। পক্ষাঘাত বা অবশ হয়ে যাওয়া অঙ্গ (যেমন— হাত) সংলগ্ন পেশি নড়াচড়ায় শক্তি ক্রমশ ফিরে আসে কিন্তু হাত দিয়ে সুস্থ কাজ করার ক্ষমতা আর কোনদিন ফিরে পায় না। চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়ে আরোগ্য লাভ দ্রুত হতে থাকে কিন্তু দুমাস পরে উন্নতি ক্রমশ কমে আসে। বিজ্ঞানীদের মতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে শক্ত আঘাত বা রক্তপাতের ফলে এ রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হঠাৎ আক্রমণে যে স্নায়ু সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারায়, সেগুলো দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এবং কার্যক্ষমতা ফিরে পায়। আর যেসব স্নায়ু সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেগুলোর কর্মক্ষমতা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা : মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা রক্ত জমাট বেঁধেছে কিনা তা নির্ণয় করে এই রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই রোগটির সঠিক কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। মস্তিষ্কের রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। রোগীর উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, জ্ঞান ফিরে পাবার পর রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী সম্ভব হলে অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে। রোগীকে উপযুক্ত শুলুখা, মলমূত্র ত্যাগের সুব্যবস্থা করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, পথ্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। প্রয়োজনবোধে রোগীকে নলের সাহায্যে খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গ নড়াচড়া করানো দরকার, এতে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের অস্থিসন্ধি শক্ত হয়ে যাওয়া রোধ করা সম্ভব হয়। রোগীর জ্ঞান ফিরে এলে নিজ প্রচেষ্টায় নড়াচড়া করতে উৎসাহিত করা উচিত। স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধের উপায় : ধূমপান পরিহার করা, যারা উচ্চরক্ত চাপে ভুগছেন তাদের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের নিয়মিত ঔষধ সেবন করা, দূচ্ছিন্তামুক্ত, সুন্দর ও সাধারণ জীবন যাপন করা।

স্নায়বিক বৈকল্যজনিত শারীরিক সমস্যা

প্যারালাইসিস : শরীরের কোনো অংশের মাংসপেশীর কার্যাবলী নষ্ট হওয়াকে প্যারালাইসিস বলে। সাধারণত মস্তিষ্কের কোনো অংশের ক্ষতির কারণে ঐ অংশের সংবেদন গ্রহণকারী পেশিগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। একজনের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ প্যারালাইসিস হতে পারে, যাতে শরীরের একপাশের কোনো অঙ্গ অথবা উভয়পাশের অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট হয়, যেমন, দুই হাত ও পায়ের প্যারালাইসিস।

কারণ : প্যারালাইসিস সাধারণত মস্তিষ্কের স্ট্রোকের কারণে হয়। এছাড়া মেবুডেন্ডের বা ঘাড়ের স্নায়ুদ্বন্দ্বিতা আঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্যারালাইসিস হতে পারে। স্নায়ু রোগ, স্নায়ুদ্বন্দ্বিতার ক্ষয় ও রোগ প্যারালাইসিস এর কারণ হতে পারে।

এপিলেপসি

এপিলেপসি মস্তিষ্কের একটি রোগ যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর ঝিচুনী বা কাঁপুনি দিতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এই রোগকে মৃগী রোগও বলা হয়। অনেকক্ষেত্রে এই রোগের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাৎ করেই সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ও শরীর কাঁপুনি দিতে দিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কোনো কারণে রোগী পানিতে পড়লে নিজে শক্তিতে উঠতে পারে না, ফলে ডুবে মারা যায়।

এপিলেপসির মূল কারণ এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। তবে মস্তিষ্কের অবস্থাগত কারণে এপিলেপসি হয়ে থাকে। ইসমিক স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের মৃগী রোগ দেখা দেয়। মাথায় আঘাতজনিত কারণে ম্যানিনিজাইটিস, এনসেফালাইটিস, এইডস, জনগত মস্তিষ্কের বিকৃতি, টিউমার ইত্যাদি কারণেও এপিলেপসির উপসর্গ দেখা দেয়। এপিলেপসি যে কোনো বয়সে হতে পারে, তবে ৫ থেকে ২০ বছর বয়সে মৃগী রোগের ব্যাপকতা বেশি দেখা যায়।

পারকিনসন রোগ

পারকিনসন রোগ মস্তিষ্কের এমন এক অবস্থা যাতে হাতে হাতে ও পায়ের কাঁপুনি হয় এবং আক্রান্ত রোগী নড়াচড়া, হাঁটাচালা করতে অপারগ হয়। এ রোগ সাধারণত ৫০ বছরের বয়সের পরে হয়। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে যুবক যুবতীদের হতে পারে। এই ক্ষেত্রে রোগটি তার বংশে রয়েছে বলে ধরা হয়।

স্নায়ু কোষ এক ধরনের নির্ধারিত তৈরি করে যাকে ডোপামিন বলে। ডোপামিন শরীরের পেশির নড়াচড়ায় সাহায্য করে। পারকিনসন রোগাক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কে ডোপামিন তৈরির কোষগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। ডোপামিন ছাড়া ঐ স্নায়ু কোষগুলি পেশি কোষগুলিকে সংবেদন পাঠাতে পারে না। ফলে মাংসপেশি তার কার্যকারিতা হারায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পারকিনসনের কারণে রোগীর মাংসপেশি আরও অকার্যকর হয়ে উঠে, ফলে রোগীর চলাফেরা, লেখালেখি ইত্যাদি কাজ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

পারকিনসন রোগ সাধারণত ধীরে ধীরে প্রকট রূপে দেখা দেয়। রোগী প্রাথমিক অবস্থায় হালকা হাত বা পা কাঁপা অবস্থায় থাকে। অনেকের একটি পা বা পায়ের পাতা নড়াচড়াতে কষ্ট হয়। এছাড়াও চোখের পাতার কাঁপুনি, কোষ্ঠকাঠিন্য, খাবার গিলতে কষ্ট হওয়া, সোজাসুজি হাঁটার সমস্যা, কথা বলার সময় মুখের বাচনভঙ্গি না আসা অর্থাৎ মুখ অনড় থাকা, মাংসপেশিতে টান পড়া বা ব্যথা হওয়া, নড়াচড়ায় কষ্ট হওয়া যেমন চেয়ার থেকে উঠা কিংবা হাঁটতে শুল্ল করার সময় অসুবিধে দেখা দেয়।

কাজ : হরমোনজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ অণুসন্ধান কর এবং একটি অনুসন্ধান মূলক প্রতিবেদন তৈরি কর।

ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ফিজিওথেরাপি গ্রহণ, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ ও সুস্থ জীবন যাপন করার মাধ্যমে রোগী অনেকটা সুস্থ থাকে।

সমস্বয় কার্যক্রমে তামাক ও মাদক দ্রব্যের প্রভাব

আমাদের দেশে সাধারণত তামাক, গাজা, ভাং, চরস, আফিম, মরফিন, কোকেন, মদ ইত্যাদি মাদক দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এছাড়া বিশ্বের কোকেন ও আফিম থেকে কৃত্রিম উপায়ে ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে। এগুলোও নেশার উদ্ভেদক করে। যেমন – ঘুমের ঔষধ।

মানুষ কেন মাদকাসক্ত হয় তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। যেমন- মাদক দ্রব্যের প্রতি কৌতূহল, বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীদের প্রভাব, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন, সহজ আনন্দ লাভ, পরিবারে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, মাদক দ্রব্যের সহজলভ্যতা, পারিবারিক কলহ ও অশান্তি, বেকারত্ব, হতাশা, অভাব অনটন, মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য।

তামাক ব্যবহারে, জর্দা চিবিয়ে নিলে কিংবা ধূমপান করলে রক্তে নিকোটিনের মাত্রা বেড়ে যায়। নিকোটিন প্রাথমিক ভাবে স্নায়ু কোষগুলোকে উদ্দীপিত করে, পরবর্তীতে দেখে নিকোটিনের চাহিদা আরও বেড়ে যায়। নিকোটিনের এই চাহিদা মেটাতে জর্দা ব্যবহার বা ধূমপানের নেশায় মানুষ আসক্ত হয়।

নিকোটিন গ্রহণে স্নায়ুকোষের কার্যকরিতা নষ্ট হয়। হাত, পা কিংবা মাথা অনৈচ্ছিক ভাবে (Voluntary) কাঁপতে থাকে। ফলে কোনো সূক্ষ্ম কাজ যেমন সুইয়ের ছিদ্রে সুতা ঢোকানো, সোজা দাগ টানা, লেখালেখিতে ব্যর্থতাজনিত সমস্যা হওয়া, ইত্যাদি দেখা দেয়। মাদক দ্রব্য ব্যবহারে স্নায়ুতন্ত্রের উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। মাদকাসক্তির কারণে ব্যক্তি তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তির ফাদে হার মেনে নেশা দ্রব্য গ্রহণে বাধ্য হয়। নেশা বস্তুর কারণে তার চিন্তাশক্তি ক্রমে লোপ পায়। তামাক ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী কাজে মনোযোগ হারায়, সাধারণ জীবনযাপনে ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত নেশায় অচৈতন্য অবস্থায় কোনো স্থানে পড়েও থাকতে পারে। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সাহায্যে নেশা থেকে এখন বের হয়ে আসা সম্ভব। এ কাজে পরিবারের সবার সহানুভূতি ও সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।

মাদকাসক্তির কুফল : মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় :

- নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রসার করা
- বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা রোধ।
- অসং বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে থাকা ও এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করা
- এ ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলা ও আইনের সঠিক প্রয়োগ করা।

মাদকাসক্তদের ঘৃণা বা অবহেলার চোখে না দেখে তাদেরকে সহানুভূতির সাথে ধৈর্য সহকারে সমাজে পুনর্বাসন বা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সহায়তা গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। দিন দিন এ অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের কার্যক্রমের মধ্যে মাদকদ্রব্য আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ, নিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন উল্লেখযোগ্য।

কাজ : তামাক ও মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পোস্টার/লিফলেট অঙ্কন কর এবং একটি শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।।

৩. 'A' এর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য।

ক. আলোক দিকমুখীতা

খ. ভূ-দিকমুখীতা

গ. পানি দিকমুখীতা

ঘ. রাসায়নিক দিকমুখীতা

৪. শীর্ষমুকুল কাটার ফলে পার্শ্বমুকুল সৃষ্টিতে কোনটি কাজ করে?

ক. অক্সিন

খ. জিব্বারেলিন

গ. সাইটোকাইনি

ঘ. অ্যাবসিসিক এসিড

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. অহনা বাবার সাথে কৃষি খামারে ঘুরতে যেয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছ পর্যবেক্ষণ করে। সে দেখল, একটি করে আলো ছায়ায় ছোট ছোট চারা গাছ রাখা আছে এবং ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা। সে আরও দেখল, কিছু ফলজ গাছের ফুল ফুটছে না, ছোট অবস্থায় ফলগুলো ঝরে পড়ছে।

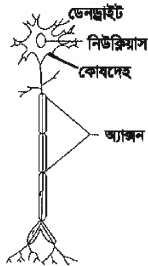
ক. বায়োজিক্যাল রুক কী?

খ. ডার্নালাইজেশন বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্ভীপকে ফলজ গাছগুলোতে এরূপ সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অহনার দেখা গাছগুলো উক্ত পরিবেশে রাখার কারণ-বিশ্লেষণ কর।

২.



ক. প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?

খ. প্রাণরস কাকে বলে বুঝিয়ে লেখ।

গ. মানবদেহে উদ্ভীপনা তৈরিতে 'A' চিহ্নিত অংশটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত কোষটির গঠন প্রকৃতি একটি সাধারণ কোষ অপেক্ষা ভিন্নতর যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।